সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা চাই
খাদ্য অধিকার আইন চাই

খাদ্য অধিকার কেন

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য
ও পুষ্টি নিরাপত্তা চাই

খাদ্য অধিকার
আইন চাই

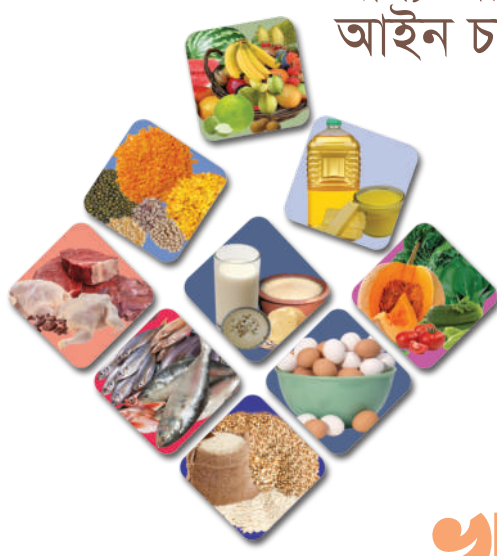

খাদ্য অধিকার কেন

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য
ও পুষ্টি নিরাপত্তা চাই

খাদ্য অধিকার
আইন চাই

খাদ্য অধিকার কেন

সম্পাদনা
মহসিন আলী
সাধারণ সম্পাদক, খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ ও
নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা সহযোগী
খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর সম্পদকমন্ডলীর সদস্য:
রতন সরকার, মনীষা বিশ্বাস, আনোয়ারুল হক,
এ. আর. আমান, সৈয়দ তরিকুল ইসলাম,
আব্দুর রহমান ও আতাউর রহমান মিটন
খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সচিবালয়ের পক্ষে:
কানিজ ফাতেমা, নাজমা সুলতানা লিলি ও দিথী সাহা

কারিগরী সহায়তা
ইফতেখার হোসেন ও অনিরুদ্ধ রায়

প্রকাশক
খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ

প্রকাশনা সহযোগী
ড্যানচার্চ-এইড বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৭

মুদ্রণ ও ডিজাইন
অর্ক

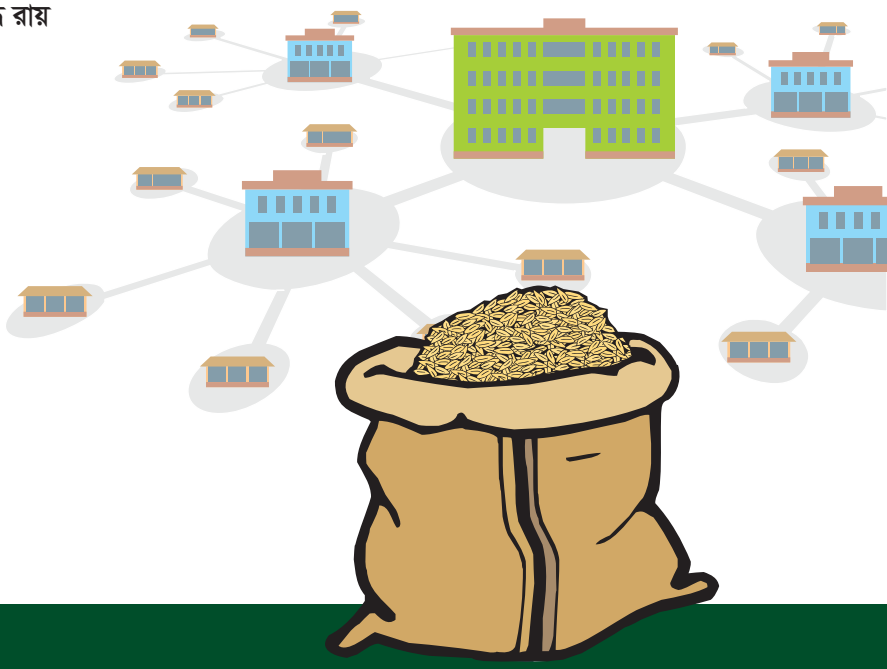

মুখবন্ধ

মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে 'খাদ্য'। আমাদের সংবিধানে যার উল্লেখ রয়েছে 'মৌলিক চাহিদা' হিসেবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৩০ সালে 'League of Nations (জাতিসংঘের প্রথম নাম)' এর উদ্যোগে 'খাদ্য নিরাপত্তা'র বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়। সেই থেকে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি পৃথিবীর সকল দেশে আলোচনার পাশাপাশি কম-বেশি কার্যকর হচ্ছে। সকল রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি থাকলেও, কল্যাণ দৃষ্টিভঙ্গীসহ বিবিধ কারণে দেশে দেশে সকল মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ হয়নি। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় খাদ্য অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির ব্যর্থতার কারণে 'খাদ্য অধিকার'-এর বিষয়টি সামনে আসে। পশ্চিম ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত আইনকে কেন্দ্র করে সকল মানুষের খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশেও এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। আমাদের দেশেও খাদ্য নিরাপত্তা নীতির আলোকে বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচির সাফল্যের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার কারণে এখনও সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। এ প্রেক্ষিতে কিছু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উন্নয়ন সংস্থা খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি 'খাদ্য অধিকার ইস্যু'তে কাজ শুরু করে। এ ধারাবাহিকতায় সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য অর্জনে ২০১৫ সালে দারিদ্র্য বিরোধী মঞ্চ/Anti Poverty Platform-APP, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ ৮০০ এর অধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং নেটওয়ার্কের উদ্যোগে ঢাকায় 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**। সম্মেলনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সভা'য় অংশগ্রহণকারী নাগরিক সমাজ এর সংগঠন ও নেটওয়ার্ক, কৃষক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সংগঠন, যুব সংগঠন, আদিবাসীদের সংগঠন, গবেষক, শিক্ষাবিদ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বঞ্চিত ও প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গের একটি সম্মিলিত জোট (Umbrella Network) হিসেবে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে নেটওয়ার্কের উদ্যোগে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে খাদ্য অধিকার, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কৃষি, নিরাপদ খাদ্য, পানি, ভূমি, খাদ্যাভাস, খাদ্য সংকট ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী ক্যাম্পেইন এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি এডভোকেসিসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। 'সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা' নিশ্চিতকরণে 'খাদ্য অধিকার বিষয়ক আইনি কাঠামো' প্রণয়ন নেটওয়ার্কের প্রধান লক্ষ্য। এ প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহসহ সামগ্রিক খাদ্য পরিস্থিতি, অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা, খাদ্য অধিকার কেন এবং আমাদের দেশে তা কিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে এ সমগ্র বিষয়টিতে কেন্দ্র করে 'খাদ্য অধিকার কেন' শীর্ষক এই প্রকাশনা। আশা করি, আমাদের এই প্রচেষ্টা সকল রাজনৈতিক দল, নীতি-নির্ধারকগণ, সরকারি কর্মকর্তা, আইনী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের নিকট খাদ্য অধিকার-এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে সহায়ক হবে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ ও
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

মহসিন আলী
সাধারণ সম্পাদক, খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ ও
নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

পটভূমি

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং লাখো শহীদের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি, মানুষে-মানুষে বৈষম্যের অবসান এবং সর্বোপরি একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। শ্রমজীবী-দরিদ্র মানুষসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। বিশেষত কৃষকদের সাফল্যে দেশে খাদ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালের আগেই দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশের বেশি কমিয়ে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (MDG) পূরণ করেছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন (enrollment), প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে ৬ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) অব্যাহত থাকার ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ৭ শতাংশের উপরে উন্নীত হয়েছে। এসকল সাফল্যের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান। ২০১৭ সালে হাওর এলাকায় অকাল বন্যা, তারপর প্রায় সারা দেশে অতিবৃষ্টি-বন্যা-সামুদ্রিক নিম্নচাপসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের বেশিরভাগ এলাকা বন্যা কবলিত হয়। এর ফলে খাদ্যশস্যসহ কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং সড়ক, ঘর-বাড়ি, প্রতিষ্ঠানসহ অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকারি গুদামে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্যের ঘাটতির কারণে অস্বাভাবিক হারে চালের দাম বাড়ার পাশাপাশি কিছুটা খাদ্য সংকট দেখা দেয়।

মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলো (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) হচ্ছে মৌলিক মানবাধিকার। আমাদের সংবিধানে যার উল্লেখ রয়েছে 'মৌলিক চাহিদা' হিসেবে। আর মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'খাদ্য'। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি রাষ্ট্র, সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য খুবই স্পর্শকাতর। ফলে সব সরকার 'খাদ্য নিরাপত্তা'র বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ত্বরান্বিত করতে ১৯৭৬ সাল থেকে 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি' বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে খাদ্যনীতির আলোকে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা ত্বরান্বিত করার অন্যতম কৌশল হিসেবে 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল-এনএসএসএস'-এর আলোকে প্রতিবছর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাজেট ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সকল দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, খাদ্য নিরাপত্তার সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুষ্টি নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য। এছাড়াও খাদ্যের প্রাপ্যতার সাথে কৃষি উৎপাদনসহ বেশকিছু বিষয় জড়িত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রকৃত মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং এসডিজির লক্ষ্য ১ ও ২ অর্জনে সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। পৃথিবীব্যাপী অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম ইউরোপসহ ধনী দেশসমূহ এবং অল্পকিছু উন্নয়নশীল দেশ ছাড়া বেশিরভাগ দেশে 'খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি' সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে 'খাদ্য অধিকার' -এর গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বেশ কিছু দেশে সকল মানুষের খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় নীতি ও আইন প্রণীত হয়েছে এবং মানুষের খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের দেশে 'খাদ্য নিরাপত্তা' বিধানে পরিচালিত কার্যক্রম কেন পুরোপুরি সফল হচ্ছে না তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি 'খাদ্য অধিকার কেন এবং কীভাবে' সকল মানুষের খাদ্য চাহিদা নিশ্চিত করতে পারে এ বিষয়ে জানা-বোঝা এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদক্ষেপ এখন সময়ের চাহিদা।

খাদ্য নিরাপত্তা: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, ১৯৩০ সালে 'League of Nations/লীগ অব নেশনস' (জাতিসংঘের প্রথম নাম)-এ বৈশ্বিক পর্যায়ে 'খাদ্য নিরাপত্তা'র বিষয়টি সর্বপ্রথম আলোচিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি জানার জন্য 'Nutrition and Public Health' শীর্ষক একটি জরিপ পরিচালিত হয়। ১৯৩৫ সালে উপস্থাপিত এ জরিপের প্রতিবেদন তথ্য দেয় যে, বিশ্বে ক্ষুধা ও অপুষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলোতে বিরাজমান চরম আকারের খাদ্য সংকট। এ প্রতিবেদনটি আমলে নিয়ে লীগ অব নেশনস্ বিভিন্ন দেশে পুষ্টি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং পুষ্টির সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করার উপরে আলোকপাত করে। তখন থেকেই পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে **'খাদ্য নিরাপত্তা'**র বিষয়টি আলোচনায় এসেছে।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাষ্ট্র স্ব স্ব দেশের প্রেক্ষাপটে 'খাদ্য নিরাপত্তা' পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নির্ধারণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত World Food Conference -এ গৃহীত সংজ্ঞা '*মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত ও কর্মময় জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে সকল সময়ে পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যে অভিগম্যতা থাকার বিষয়টিকেই 'খাদ্য নিরাপত্তা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে; যেখানে খাদ্য প্রাপ্যতা, খাদ্যে অভিগম্যতা ও খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে।*' ইতোমধ্যে পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রায় সব উন্নত দেশে নাগরিকদের জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশে খাদ্য নিরাপত্তা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়নি।

খাদ্য নিরাপত্তা: জাতীয় প্রেক্ষাপট

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সূত্রপাত। ১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকটের পর ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) কর্মসূচি চালু হয়। সেই থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সংখ্যা, বাজেট বরাদ্দ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়েছে। এসব কর্মসূচির অধীনে খাদ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা, টেস্ট রিলিফ, খাদ্য সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রামে), বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান, ওএমএস, ফেয়ার প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে চাল ও গম বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। এসব উদ্যোগ গত চার দশকে দারিদ্র্যের তীব্রতা প্রশমনের পাশাপাশি দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তরণের সক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে ক্ষুধাভিত্তিক দারিদ্র্যহ্রাসের মাধ্যমে।

এ ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে চলমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোকে আরও নিখুঁত, দক্ষ ও কার্যকর করে তোলা এবং ব্যয়িত অর্থ থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত হয় 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (National Social Security Strategy-NSSS)'। এনএসএসএস-এর দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হচ্ছে-'বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা কার্যকরভাবে দারিদ্র্য ও অসমতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করতে পারে এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে।' এখানে বলা প্রয়োজন যে, এনএসএসএস বাস্তবায়নের সময়কাল হিসেবে প্রথম ধাপের ১০ বছর (২০১৫-২০২৫) এবং ২০২৬ সাল থেকে দ্বিতীয় ধাপ শুরু করার কথা বলা হয়েছে।

এনএসএসএস-এর আলোকে চলমান 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র পর্যালোচনায় দেখা যায়:

- **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উত্তরণে জীবনচক্রভিত্তিক এনএসএসএস কৌশল হিসেবে ভালো।**
- **এনএসএসএস-এর আলোকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের বিক্ষিপ্ততা, সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমএন্ডই) ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবা প্রদানে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টারে বিন্যস্ত করে প্রতিটি ক্লাস্টারের সমন্বয়ের জন্য একটি মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় (সমাজকল্যাণ, খাদ্য, অর্থ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) সুনির্দিষ্ট করার পরিকল্পনা ভালো। তবে এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন পর্যায়ে অগ্রগতি যথেষ্ট নয়।**
- **ডাটাবেজ না থাকায় এখনও সবক্ষেত্রে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন হচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে উপকারভোগীগণ বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ পান না।**
- **এনএসএসএস-এর রূপকল্পের আলোকে সময়কাল অনুযায়ী উপকারভোগী বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনের চেয়ে বাজেট বরাদ্দ কম।**
- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ একক কর্মসূচি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতাও এর অধীনে রাখা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?**
- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অতীতের মতো আগামীতেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে।**
- **সর্বোপরি, পৃথিবীব্যাপি অভিজ্ঞতায় পরিলক্ষিত হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয় দিক থেকেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না।**

খাদ্য মন্ত্রণালয়-এর কার্যক্রম

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে প্রধান দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয়ের কাজের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় জাতির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে প্রণীত হয়েছে জাতীয় খাদ্যনীতি। নীতিতে খাদ্য নিরাপত্তাকে এমন একটি অবস্থা হিসেবে বলা হয়েছে– যখন সকলের জন্য একটি কর্মক্ষম, স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বজায় থাকে। খাদ্যনীতিতে যথার্থভাবেই খাদ্য নিরাপত্তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের লভ্যতা (food availability), ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilization of food)-এ তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। খাদ্যনীতির আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয়-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম:

লক্ষ্য

- সকল সময় দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য

- দেশের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান;
- নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রম

দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন, নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ, খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ, রেশনিং ব্যবস্থাপনা, খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং আমদানি, রপ্তানি ও স্থানীয় পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ, খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ, মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ সংরক্ষণ, খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'খাদ্য অধিদপ্তর' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর সকল কার্যক্রমও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন। দেশের সার্বিক খাদ্যব্যবস্থা পরিচালনা এবং খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণসহ খাদ্য পরিস্থিতির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সার্বিক দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের।

মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়:

- **খাদ্য নীতির লক্ষ্যের আলোকে উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।**
- **দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।**
- **খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির অগ্রগতির পাশাপাশি বেশ কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।**
- **পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য পরিস্থিতির তেমন উন্নয়ন হচ্ছে না।**
- **বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষকদের বঞ্চিত করে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ খেকে সরকারি খাদ্যশস্য (চাল ও গম) ক্রয়ের অভিযোগ রয়েছে।**
- **বিগত কয়েক বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে সরকারি গুদামে ৬-৭ লক্ষ টন ধান-চালের মজুদ থাকলেও ২০১৭ সালের বন্যা পরবর্তী সময়ে ২ লক্ষ টনেরও কম মজুদ ছিল।**
- **এ পরিস্থিতিতে শুল্ক প্রত্যাহার করে বেসরকারিভাবে চাল আমদানির সুযোগ দিলেও চালের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকার ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।**
- **২০১৭ সালে বন্যা পরবর্তী সময়ে সকল প্রকার চালের মূল্য ৩০ শতাংশ বেড়েছে।**
- **চলতি অর্থবছরের (২০১৭-১৮) জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ২ হাজার ৯১২ কোটি টাকার চাল আমদানি করা হয়েছে। গতবার একই সময়ে মাত্র ৩৫ কোটি টাকার চাল আমদানি করা হয়েছিল।**
- **সর্বোপরি, খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দরিদ্র জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি।**

পুষ্টি নিরাপত্তা

খাদ্য নিরাপত্তার সাথে পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মায়ের গর্ভ থেকে শিশুর জন্ম, বেড়ে ওঠা, যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও বেঁচে থাকার জন্য 'প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তি' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য আমাদের শরীরে পুষ্টি জোগায়, ক্ষয় পূরণ করে এবং নতুন উদ্যমে কাজ করার শক্তি দেয়। খাবারের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন মানুষের জীবনধারণের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও উৎপাদনশীলতার ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখে।

উন্নততর পুষ্টি, সেইসাথে পর্যাপ্ত মান ও পরিমাণে খাদ্যগ্রহণ এবং অসুস্থতার হার কমানো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য বলতে শুধুমাত্র ভাত-রুটি-ডাল নয়, তার সাথে প্রয়োজনীয় আমিষ অর্থাৎ মাছ-মাংস-ডিম-দুধ, শাক-সবজি, মিষ্টি, ফলমূল ইত্যাদিসহ প্রতিদিন একজন মানুষের ২ হাজার ১২২ কিলো ক্যালরি পরিমাণ সুষম খাদ্যের নিশ্চয়তা থাকা দরকার। দেশের অপুষ্টির পরিসংখ্যানগত তথ্য পুষ্টি বিষয়ক সমস্যাকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agriculture Organization-FAO)-এর মতে, এমডিজি সময়কালে বাংলাদেশে খর্বতা, কৃশতা ও কম ওজনসম্পন্ন শিশুদের সংখ্যা কমলেও বিশ্বে অপুষ্টির হার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।

সারণি: পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের কম ওজনসম্পন্ন, খর্বতা ও কৃশতার পরিসংখ্যান (২০০৭-২০১৪)

	২০০৭	২০১১	২০১৪
কম ওজনসম্পন্ন	৪১.০	৩৬.০	৩২.৬
খর্বতা	৪৩.০	৪১.৩	৩৬.১
কৃশতা	১৭.৪	১৫.৬	১৪.৩

Source: Milennium Development Goals: End-Period Stocktaking and Final Evaluation Report (2000-2015), GED

উপরে বর্ণিত তথ্যের পাশাপাশি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফ্রি) 'গ্লোবাল নিউট্রিশন রিপোর্ট ২০১৬: ফ্রম প্রমিজ টু ইমপ্যাক্ট' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, শিশুর অতিরিক্ত ওজন না থাকার তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে বেশ ভালো। শিশুর অতিরিক্ত ওজন অপুষ্টির লক্ষণ। বুকের দুধ খাওয়া শিশুর হার, নারীর রক্তস্বল্পতা, বয়স্কদের স্থূলতা, ডায়াবেটিসের প্রকোপ– এসব সূচকের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের অবস্থানের তালিকা তৈরি করা হয়েছে বৈশ্বিক পুষ্টি প্রতিবেদনে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালিকার নিচের দিকেই বাংলাদেশের অবস্থান। যেমন- ছয় মাস পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২৯ এবং নারীর রক্তস্বল্পতা কম থেকে বেশির যে ক্রম, সে তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৮। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৪৪ শতাংশ নারী রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন। খাদ্য ঘাটতিসহ অধিকাংশ সময় দরিদ্র পরিবারের নারীরা নিজে না খেয়ে তাদের সন্তানদের জন্য খাবার রেখে দেয়। বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতির এই চিত্র নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। আমাদের সংবিধান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন অঙ্গীকারের আলোকে সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের সাথে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার।

খাদ্যের প্রাপ্যতা ও কৃষি

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান। কৃষকদের সাফল্যে বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যের মূল উপাদান ধান উৎপাদনে দেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশাপাশি সবজি, বেশ কিছু ফল ও পোল্ট্রি উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে গম, ডাল, তেল, মসলা, দুধ, গরুর মাংস ইত্যাদি অনেক খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা আমদানির ওপর নির্ভরশীল। বিগত কয়েক বছরে দেশে বড় আকারে কোনো বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়নি। তবে ২০১৭ সালের মার্চ মাসে হাওর এলাকায় অকাল বন্যা, তারপর প্রায় সারা দেশে অতিবৃষ্টি-বন্যা-সামুদ্রিক নিম্নচাপসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জুলাই-আগস্ট মাসে পুনরায় দেশের বেশিরভাগ এলাকা বন্যা কবলিত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি সংকটের মুখে পড়ে। এরফলে-

- **খাদ্যশস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ সকল কৃষিপণ্যের উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়;**
- **শুধুমাত্র হাওর এলাকায় ৩ লক্ষ হেক্টর জমির বোরো ধান পুরোপুরি ডুবে যায় এবং ব্যাপক পরিমাণে মাছ নষ্ট হয়;**
- **পরবর্তী সময়ে দেশের বেশিরভাগ স্থানে ধানসহ সকল কৃষিপণ্যের ব্যাপক ক্ষতির কারণে উৎপাদন কম হয়;**
- **ধান উৎপাদনে ঘাটতির কারণে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রচুর চাল আমদানি করতে হয়;**
- **নিয়ম বহির্ভূতভাবে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে বেশিরভাগ সরকারি খাদ্যশস্য (চাল ও গম) ক্রয়ের কারণে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়;**
- **এ বছর কৃষক উৎপাদিত ধানের দাম বেশি পেলেও গত কয়েক বছর ধরে ধানসহ বেশ কিছু কৃষিপণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পায়নি;**
- **কৃষিপণ্য উৎপাদনে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব প্রতিনিয়ত বাড়ছে;**
- **দেশে ধান উৎপাদনে ঘাটতি ও আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম বাড়ার প্রবণতাসহ সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আগামীতে চালসহ খাদ্যশস্যের দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে;**
- **চাল ছাড়া গম, ডাল, তেল, মসলা, দুধসহ অন্যান্য অনেক খাদ্যপণ্যের উৎপাদনে ঘাটতির কারণে আমদানি নির্ভরতা দিন দিন বাড়ছে।**

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমদানি কমিয়ে ক্রমান্বয়ে সব ধরনের খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, যথাযথ বিনিয়োগ এবং কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নিরাপদ খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়

নিরাপদ খাদ্য

উন্নত বিশ্বসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে নিরাপদ খাদ্য বলে আলাদা কোনো খাদ্য নেই, কারণ খাদ্য নিরাপদ হবে সেটাই স্বাভাবিক। বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের দেশে খাদ্যে ভেজাল এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারসহ বহুবিধ কারণে 'নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি' এক অনিশ্চয়তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত হাতে বা মেশিনে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের বেশিরভাগ উপকরণের মধ্যে ভেজাল এবং নিম্নমানের উপাদান এখন নৈমিত্তিক ঘটনা। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের নামে মাছ, শাক-সবজি, ফল, এমনকি দুধ এবং মাংসেও মানব শরীরের জন্য ক্ষতিকর ফরমালিন বা এ ধরনের বহুবিধ রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ফল পাকানো এবং রং করার জন্যও কার্বাইডসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার হচ্ছে। মাছ সংরক্ষণের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত ডিডিটি ব্যবহার করা হয়। প্যাকেটজাত খাবারেও বিভিন্ন ক্ষতিকারক রং ও রাসায়নিক মেশানো হয়। খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অত্যাধিক ব্যবহারের কারনে সেগুলো পানি ও মাটির সাথে মিশে উৎপাদিত ফসল, ফলমূল ও শাক-সবজির মধ্যে প্রবেশ করে, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পাশাপাশি গরু ও মুরগি পালনে ব্যবহৃত ইউরিয়া সার, গ্রোথ হরমোন ও এন্টিবায়োটিক খাদ্যে বিষক্রিয়ার আরেক ভয়াবহ কারন। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং এ লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আগের আইন রহিত করে গৃহীত হয়েছে **'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'**। এটি নি:সন্দেহে একটি ভালো আইন। আইনে 'নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ'এবং নবম অধ্যায়ের ৫৮ নং ধারায় অপরাধ, দণ্ড, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিধান লঘনের দণ্ড হিসেবে সুনির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। অনিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণে 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' কাজ করছে এবং আইনে 'বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত'--এর বিধান রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে নিরাপদ খাদ্য আইন-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

পানি

উজানে অবস্থিত দেশসমূহ তাদের নিজেদের দেশে বাঁধ দেওয়ায় ভাটির দেশ হিসেবে আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত নদীর পানি এবং নাব্যতা কমে যাচ্ছে। এর প্রভাবে বেশিরভাগ নদী ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে শীর্ণকায় হচ্ছে অথবা মরে যাচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ পড়ছে এবং পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নেমে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে মুক্ত জলাশয়ে মাছের বিচরণ ক্ষেত্র। উপকূলীয় অঞ্চলের পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ওই এলাকার মানুষ সুপেয় পানির সংকটে ভুগছে। অপরদিকে, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, আর্সেনিকের বিস্তৃতি ও দূষণের কারণে খাবার ও গৃহস্থালীসহ সব ক্ষেত্রে দেশব্যাপী সুপেয় পানির সংকট দিন দিন বাড়ছে। নদীতে পানির প্রবাহ বাড়ানোর জন্য দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক উদ্যোগ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগ প্রয়োজন।

ভূমি

পানি ছাড়াও কৃষিখাত গভীরভাবে ভূমির গঠন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল, যা খাদ্য উৎপাদনের অন্যতম অনুষঙ্গ। অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্প-কারখানা, রাস্তা-ঘাট, বিনোদন কেন্দ্র, বসতবাড়ি নির্মাণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতির অনুপস্থিতি, আইন না মানার প্রবণতা এবং এসব নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের যথাযথ উদ্যোগ না থাকায় ক্রমান্বয়ে কৃষিজমি কমছে। কৃষিকাজে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন ও চিংড়ি চাষের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে জমির লবণাক্ততা বাড়ছে। খাদ্য উৎপাদনসহ বৃহত্তর কৃষি খাতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সার্বিকভাবে দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। নীতি

থাকা স্বত্ত্বেও ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টন উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর হয়নি। এ সব কিছুর প্রভাব খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করতে পারে। সেজন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজমির সংস্থান, পরিবেশসম্মত চাষাবাদ ও সকল ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারে নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

খ্যাদ্যাভ্যাস

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বশীল খাদ্যাভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্যের Value Chain, অর্থাৎ উৎপাদন ও মাড়াই-সংগ্রহ ও সংরক্ষণ-প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং-বণ্টন ও বিপণন-ভোগ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে খাদ্যের ক্ষতি এবং অপচয় হয়ে থাকে। ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় জানা যায়, দেশে মোট ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্যের গড়ে ৫.৫ শতাংশ অপচয় হয়। যার মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত পর্যায়ে ৩ শতাংশ, খাদ্য প্রস্তুত থেকে খাবার পরিবেশন পর্যায়ে ১.৪ শতাংশ এবং প্লেটবর্জ্য হিসেবে ১.১ শতাংশ। একদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য গ্রহণের গড় পরিমাণ কম, অন্যদিকে খাদ্যের অপচয়, খাদ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও অসচেতনতার কারণেও খাদ্যের পুষ্টিগুণ হারায়। পরিবার পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির অবস্থা উন্নত করার জন্য খাদ্য অপচয় কমাতে আরও সচেতনতা প্রয়োজন।

খাদ্য সংকট

কোনো এলাকায় হঠাৎ ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান না থাকলে তাকে খাদ্য সংকট বলে অভিহিত করা যেতে পারে। আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাধারণভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয় না। তবে ২০১৬ সালে বান্দরবান জেলার থানচিতে হঠাৎ খাদ্য সংকট দেখা দেয়, যে সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনও অবহিত ছিল না। সেখানে পরিভ্রমণকারী একদল শিক্ষার্থী সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে বিষয়টি শেয়ার করলে সবাই তা জানতে পারে। এরপর সরকারের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। পরবর্তী সময়ে রাঙামাটি জেলার সাজেক ভ্যালিতেও খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। এছাড়া যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও হঠাৎ করে খাদ্য সংকট হতে পারে। জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং স্থানীয় জনগণের সবসময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যাতে দেশের যেকোনো স্থানে হঠাৎ খাদ্য সংকট দেখা দিলে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে পারে।

বর্তমান দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও বৈষম্য পরিস্থিতি

- **বিবিএস-এর ২০১৬ সালের জরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশ এবং অতি দরিদ্র মানুষের হার ১২.৯ শতাংশ ।**
- **দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ২০ লক্ষ। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ। অতি দরিদ্র ২ কোটি ৮ লক্ষ।**
- **জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে দরিদ্র মানুষের হার কমলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি থেকেই যাচ্ছে।**
- **এদের বেশিরভাগ দৈনিক ২ হাজার ১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না।**
- **শীর্ষ ১০ ভাগ ধনী পরিবারের আয় মোট জাতীয় আয়ের ৩৮ শতাংশ।**
- **নিম্নে অবস্থানকারী ১০ ভাগ অতি দরিদ্রের আয় মোট জাতীয় আয়ের ১ শতাংশ।**
- **এজন্য সমাজে আয়-বৈষম্যের ব্যাপকতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভোগের বিতরণের তুলনায় আয়ের বণ্টনের জন্য জিনি সহগ দ্বারা নির্ণিত আয়-বৈষম্য ০.৪৬ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ০.৪৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার আয়-বৈষম্য কমার নিশ্চয়তা দেয় না।**

উপরের আলোচনায় খাদ্য নিরাপত্তা ত্বরান্বিত করতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতি ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, সবক্ষেত্রে কম-বেশি সাফল্যের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার দিকও রয়েছে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের সংবিধানসহ বিভিন্ন নীতি এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকারের অঙ্গীকারসমূহ নিম্নরূপ:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে 'মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা' অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে "... (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (খ) কর্মের অধিকার ... এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিস্থতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।"

- সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে 'জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা' অংশে বলা হয়েছে "জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন ...।"

- ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২৫(১) ধারা অনুযায়ী "প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের এবং তার পরিবারের কল্যাণ ও সুস্বাস্থের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবাসহ জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মানের অধিকার রয়েছে ...।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

- বাংলাদেশের ৮০০-এর অধিক নাগরিক সংগঠন, নেটওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠান-এর সমন্বয়ে গঠিত **'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে বিগত ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন ২০১৫ ঢাকায় 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** বলেন, **'দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল জুড়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরো সমুন্নত করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকবে।' তিনি সার্ক খাদ্য ব্যাংক ও বীজ ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করতে ইঙ্গিত প্রদান করেন।**

- বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ `Sustainable Development Goal-SDG' বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী** বলেছেন, **'আমাদের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশের ঝুঁকিগুলো যেমন একে অন্যের সাথে যুক্ত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো নিয়ে আমাদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন বৈশ্বিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রয়োজন উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর, সামর্থ্য ও জাতীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্যসূচি বা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। আর এ কারণে, এসডিজি পূরণে বাংলাদেশের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'এ অঙ্গীকারের অংশ হিসাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।'**

- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুসারে পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে গৃহীত 'অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি'র (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) ১১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে খাদ্য অধিকারকে বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়; যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, "এই চুক্তির পক্ষ রাষ্ট্রসমূহ স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং জীবনমানের ধারাবাহিক উন্নতিসহ তার নিজের এবং পরিবারের পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন জীবনযাপনের অধিকার আছে (১১.১)।" অন্যদিকে ১১.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে পক্ষরাষ্ট্রসমূহে ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্তির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

- সরকারের রূপকল্প (ভিশন ২০২১) অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম দৈনিক ২ হাজার ১২২ কিলো ক্যালরির উর্ধ্বে খাদ্য নিশ্চিত করা।

- ২০১৫ সালে গৃহীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 'খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। যথাক্রমে: ১. নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা; ২. খাদ্যে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো এবং ৩. সবার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা।

- সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া।

- এসডিজি-এর ১নং লক্ষ্যে-২০৩০ সালের মধ্যে 'সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান' এবং ২নং লক্ষ্যে অগামী ১৫ বছরে 'ক্ষুধামুক্তি'র অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে।

খাদ্য অধিকার কেন

খাদ্য নিরাপত্তা ত্বরান্বিত করতে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্যের প্রাপ্যতা ও কৃষি, নিরাপদ খাদ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের তথ্য ও পর্যালোচনায় সাফল্যের পাশাপাশি অনেক সীমাবদ্ধতার দিকও দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও বৈষম্য পরিস্থিতির তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২ কোটি অতিদরিদ্র মানুষের পাশাপাশি দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী ৪ কোটি মানুষ দীর্ঘ সময়কাল ধরে প্রতিদিন ২ হাজার ১২২ কিলো ক্যালরি খাবার পায় না। এক্ষেত্রে মৌলিক সীমাবদ্ধতার দিকসমূহ:

- **দেশে যথেষ্ট ভালো একটি খাদ্যনীতি থাকলেও দীর্ঘ সময়কাল ধরে নীতির উদ্দেশ্যসমূহ যথাযথভাবে অর্জিত হচ্ছে না;**
- **খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে এনএসএসএস-এর প্রধান কৌশল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনের তুলনায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনপ্রতি বাজেট বরাদ্দ কম;**

- **ডাটাবেজ না থাকায় সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন এবং বরাদ্দ অনুযায়ী উপকারভোগীদের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদানে দীর্ঘ সময়কাল ধরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে;**
- **জাতিসংঘের FAO-এর মতে, এমডিজি সময়কালে বাংলাদেশে খর্বতা, কৃশতা ও কম ওজনসম্পন্ন শিশুদের সংখ্যা হ্রাস পেলেও বিশ্বে অপুষ্টির হার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ;**
- **'গ্লোবাল নিউট্রিশন রিপোর্ট ২০১৬: ফ্রম প্রমিজ টু ইমপ্যাক্ট' প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৪৪ শতাংশ নারী রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন;**
- **দারিদ্র্যের হার কমলেও দীর্ঘ সময়কাল ধরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি থেকেই যাচ্ছে এবং এদের অধিকাংশ দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না;**
- **প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য না পেয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষতির ফলে তাদের শিক্ষাজীবন ও পরবর্তীতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য থেকেই যায়;**
- **এ অবস্থায় সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার অন্যান্য শর্ত পূরণ হলেও সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায় ঘাটতি থেকে যাবে;**
- **রাষ্ট্র জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তির বিষয়টিকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকার করলেও খাদ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হয়ে থাকে সাধারণত দান বা সেবামূলক;**
- **পৃথিবীব্যাপী অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে 'খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি' সব মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না;**
- **সামগ্রিক বিবেচনায় আমাদের দেশেও সব মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।**

আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির ব্যর্থতার কারণে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে 'খাদ্য অধিকার' -এর গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পশ্চিম ইউরোপীয় বেশিরভাগ দেশ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করায় সে সব দেশে সব মানুষের খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সব ধনী দেশ আইন বা নীতির মাধ্যমে তাদের দেশের সকল মানুষের খাদ্য অধিকার/ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইক্যুয়েডর, এল সালভেদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, মেক্সিকো, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া, প্যারাগুয়ে, পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া, উগান্ডা ও ভেনিজুয়েলা ইতিমধ্যে খাদ্য অধিকার/খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে। এ সব দেশে পর্যায়ক্রমে সব মানুষের খাদ্য অধিকার কার্যকর হচ্ছে। নেপালের সংবিধানে সব মানুষের খাদ্য অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। এসব দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনায় বলা যায়, সব মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করার বিষয় সেবামূলক নয় অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখা দরকার। আমাদের দেশে সংবিধানের আলোকে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ২০২১ সালের মধ্যে প্রকৃত মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়া, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এসডিজির ১ ও ২ নং লক্ষ্য পূরণসহ সকল আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সব মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে 'খাদ্য অধিকার' ধারণার আলোকে যথাযথ উদ্যোগ বর্তমান সময়ের চাহিদা।

খাদ্য অধিকার ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা

অধিকার হলো কিছু স্বীকৃত বা বৈধ ক্ষমতা, যা মানুষ তার বিশেষ অবস্থানের কারণে ভোগ করে থাকে। আমরা জানি, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো এটি অবিভাজ্য, সর্বজনীন, অপ্রত্যাহারযোগ্য ও সহজাত। সে অর্থে খাদ্য অধিকার একটি মানবাধিকার। মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত অন্য অধিকারগুলো অর্জনে খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এটি কোনো দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, বরং প্রতিটি মানুষ মর্যাদার সাথে নিজের খাদ্যের সংস্থান করার সামর্থ্য অর্জন করবে সেটাই খাদ্য অধিকারের লক্ষ্য। তাই খাদ্য অধিকারের

সঙ্গে মানুষের মর্যাদার সঙ্গে বসবাস, ক্ষুধা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্ত জীবনযাপনের অধিকারও ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত।

নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন যে, 'ক্ষুধা ও অপুষ্টি শুধু খাদ্যের অপ্রতুলতার কারণেই ঘটে না, সামাজিক আয়-বৈষম্যই দরিদ্র মানুষকে পর্যাপ্ত খাদ্য পাবার অর্থনৈতিক অভিগম্যতা থেকে বিরত রাখে'। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, **'খাদ্য অধিকার হচ্ছে এমন একটি অধিকার যা নারী, পুরুষ ও শিশুসহ সকল ব্যক্তি অথবা সমাজের কাছে সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে শারীরিক বা মানবিক চাহিদা পূরণ করে এবং অবশ্যই তা মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন অর্থনৈতিক ও খাদ্য কেনার অভিগম্যতাকে নিশ্চিত করে।'** পাঁচটি উপাদানের ভিত্তিতে খাদ্য অধিকার বিষয়টিকে আলোকপাত করা হয়। যথা:

১. **প্রাপ্যতা (Availability):** *খাদ্যের প্রাপ্যতা হচ্ছে উৎপাদনশীল জমি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সরাসরি খাদ্য গ্রহণের সুযোগ থাকা; একটি দক্ষ বণ্টন ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনস্থল থেকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে খাদ্যের যোগান দেয়া।*

২. **স্থিতিশীলতা (Stability):** *একটি স্থিতিশীল খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন; সকল সময়ে সকল স্থানে খাদ্য প্রাপ্যতার বিষয়টি স্থিতিশীল হতে হবে।*

৩. **অভিগম্যতা (Accessibility):** *সকল মানুষ যেন অর্থনৈতিক ও শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে পর্যাপ্ত খাদ্য পায়। পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ এবং গ্রহণের খরচ এমন হতে হবে যাতে তা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা সন্তোষজনকভাবে পূরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি না করে।*

৪. **স্থায়িত্বশীলতা (Sustainability):** *প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যাতে তা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করে।*

৫. **পর্যাপ্ততা (Adequacy):** *প্রত্যেক ব্যক্তির পুষ্টি চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের যোগান অবশ্যই থাকতে হবে, যা হবে ক্ষতিকর পদার্থ মুক্ত এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য।*

খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের তিন ধরনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যথা-

- **Obligation to Respect/সম্মান প্রদর্শন করা:** রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির পর্যাপ্ত খাদ্যে অভিগম্যতা স্থায়ী ও টেকসইভাবে নিশ্চিত করবে। কোন ব্যক্তির খাদ্যের অধিকার অনুশীলনে বাধা পড়ে এমন কোনো পদক্ষেপ থেকে রাষ্ট্র বিরত থাকবে।

- **Obligation to Protect/রক্ষা করা:** রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে কোনো ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তির খাদ্য অধিকার অর্জনে বাধার সৃষ্টি না করে তার দেখভাল করা। সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য, আইনের শাসনের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করা এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

- **Obligation to Fulfill/পূর্ণ করা:** রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সম্পদের ব্যবহার ও প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। এই দায়িত্ব শুধু যে আর্থিকভাবে হবে এমন নয় বরং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কৃষি সংস্কার, শহর ও পল্লী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি হতে পারে। আবার, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোনো কারণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী খাদ্যের সংস্থান করতে না পারলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো তাদের খাবার সরবরাহ করা।

অর্থাৎ, খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র যেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, তেমনি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারণে কেউ যেন খাদ্য অভিগম্যতা থেকে বঞ্চিত না হয় তারও নিশ্চয়তা দেবে রাষ্ট্র।

বাংলাদেশে খাদ্য অধিকার বাস্তবায়ন

এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলোচনায় এ প্রশ্ন উঠে আসে যে, রাষ্ট্র সকল মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করবে কিনা। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, রাষ্ট্রকে বেশিরভাগ মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদানে সরাসরি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হয় না। খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের তিন ধরনের বাধ্যবাধকতার কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। যার মূল কথা হচ্ছে- কোনো ব্যক্তির খাদ্যের অধিকার অনুশীলনে বাধা পড়ে এমন কোনো পদক্ষেপ থেকে রাষ্ট্রের বিরত থাকা এবং কোনো ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তির খাদ্য অধিকার অর্জনে বাধার সৃষ্টি না করে তার দেখভাল করা। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরের (দারিদ্র্য ইত্যাদি) কোনো কারণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী খাদ্যের সংস্থান করতে না পারলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো তাদের খাবার সরবরাহ করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব, অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরাসরি খাদ্য সহায়তা এবং কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া। সরকার দীর্ঘসময় ধরে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কিন্তু এতে সকলের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না বলেই খাদ্য অধিকার প্রসঙ্গ সামনে এসেছে। খাদ্য অধিকার কার্যকর করতে হলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন করতে হবে। যে কোনো বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলে তার বাস্তবায়নও ত্বরান্বিত হয় এবং সেক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কার্যকরী হয়। প্রসঙ্গত, নীতি-নির্ধারকদের কারো কারো সাথে আলোচনার সময় তারা আইনি বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। সেক্ষেত্রে চলমান খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, পুষ্টি কার্যক্রম এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে কৃষিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম 'খাদ্য অধিকার আইন'-এর সাথে সংযুক্ত করা গেলে, অতি দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দিয়ে পর্যায়ক্রমে সবার জন্য খাদ্য অধিকারের বিধান আইনেই থাকতে পারে। পাশাপাশি এসকল কাজের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত বর্তমান অর্থ ও সম্পদের দ্বারা আইনি কাজ শুরু করা যেতে পারে। তবে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং সে আলোকে বাজেট বরাদ্দের বিধান নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহন করতে হবে। তবে আইন প্রণয়নে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই এ প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পাশাপাশি নীতি-নির্ধারকগণ, সরকারি কর্মকর্তা, আইনি ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ, সকল পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সকল স্তরের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। তবে সবার আগে দরকার খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

'খাদ্য অধিকার'-বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের ভূমিকা

উল্লেখ্য যে, দাবি তুললেই যেমন আইন প্রণয়ন হয় না, আবার আইন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তার যথাযথ বাস্তবায়ন হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন থাকলেও বাস্তবায়ন না হওয়ার প্রধান কারণ, ঐ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উদ্যোগ এবং জনসচেতনতার ঘাটতি। তাই যে কোনো আইন প্রণয়নের দাবির সাথে সকল রাজনৈতিক দল, নীতি-নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। পাশাপাশি জনসচেতনতা থাকলে সে আইনের বিধানাবলী ভালো হয় এবং তার বাস্তবায়নও সহজে ত্বরান্বিত হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এর কোনো বিকল্প নেই।

সেক্ষেত্রে খাদ্য অধিকার বিষয়ে সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল এবং নীতি-নির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মনোযোগ সৃষ্টি ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সচেতন নাগরিক সমাজকেই উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নের পক্ষে যৌক্তিক দাবির বিষয়ে এনজিও, গবেষক, শিক্ষাবিদ, কৃষক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সংগঠন, প্রতিবন্ধীদের সংগঠন, আদিবাসীদের সংগঠন, যুব সংগঠন প্রভৃতি সংগঠনসমূহ ও সংগঠকদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশব্যাপী ক্যাম্পেইন, লবিং ও পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নাগরিকদের সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে critical mass সৃষ্টি করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, নীতি নির্ধারকগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

DCA
actalliance

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
সচিবালয়: ওয়েভ ফাউন্ডেশন অফিস, ৩/১১, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ০১৭৫৫৬৫৫৪৩০, ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০, ফ্যাক্স: ৮১৪৩২৪৫, ৫৮১৫১৬২০ এক্স-১২৩,
ইমেইল: info.rtfbd@gmail.com, ওয়েব: www.rtfbangladesh.org
ফেইসবুক: www.facebook.com/RighttoFoodBangladesh